ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ৯, সংখ্যা ২১, সেপ্টেম্বর, ২০২২

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
Vol. 9th Issue 21th, Sept., 2022

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক
সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya,
Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 9th Issue 21th, 26th Sept., 2022, Rs. 700/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
৯ ম বর্ষ ও ২১ তম সংখ্যা
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৭০০ টাকা

ভেজা বারুদ : এক বিপন্ন সময়ের চিত্র; সিন্ডিকেট রাজ

রাকেশ জানা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মেদিনীপুর সিটি কলেজ

সারসংক্ষেপ : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখায় বৈচিত্র্য রয়েছে, তথ্যের সমাহারে মেধা, বৌদ্ধিকতা ও অভিজ্ঞতার মিশেলে উদ্বাবনী শক্তিতে লেখক বিপন্ন সময়ের দলিল নির্মাণ করেছেন। যাতে মিশে রয়েছে ক্ষমতা বদলের রাজনীতি। লেখক উপন্যাস সূচনা করার পূর্বে এক স্থানে লিখেছেন- "যে সময়ের মধ্যে আমরা স্থিত রয়েছি, সেই সময়কে কেন্দ্র করে কিছু লেখার মধ্যে একটা ঝুঁকি থেকে যায়। একটু দূরে সরে গিয়েই সময়কে বিচার করা রীতি সিদ্ধ। তবু সময়কে এড়িয়ে গিয়ে চোখ বুজে কোকিলের দিকে কান ফেরানোয় অন্তরের সায় থাকে না অনেক সময়। এই উপন্যাসের সমসময়ের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা, মূল চরিত্রের সাধারণ জন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস"। আসলে প্রতিদিন আমরা নিজেদেরকে অপরের কাছে বিকিয়ে দিচ্ছি। প্রতিনিয়ত এই শাসক শ্রেণির মানুষেরা আমাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। স্বপ্নময়ের উপন্যাসে ঠেসে দেওয়া হয় জনপ্রিয়তার সস্তা মাল-মশলা, আবার অন্যদিকে এসব ছাপিয়ে উচ্চকিত হয়ে ওঠে মানবিক সুর। এই মানবিক সুরকে প্রকাশ করার জন্য তিনি বেছে নেন অতি সাধারণ মানুষকে। সময়ের সরলরৈখিকতাকে গ্রাহ্য করে তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠেছে বিপন্ন মানবতার বিষাদগাথা। ক্ষমতা, রাজনীতি, যৌনতাকে একটি মৌলিক দৃষ্টিকোন থেকে প্রকাশ করেছেন লেখক। সমসাময়িক ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাচারিতা, বুজরুকি তথা গোঁজামিলকে তুলে ধরেছেন লেখক। রাজনৈতিক গুন্ডাদের শাসানিতে খাঁচায় বন্দি সাধারণ মানুষ। শাসক বদলায় ক্ষমতার রূপ বদলায়, পরিবর্তন আসে কিন্তু শোষক-শোষিত শ্রেণির অবস্থান একই থাকে। দুনিয়াতে সৎ ও সাধারণ মানুষেরা সর্বদাই দুঃখী। এরাই হয় soft target, রাজনীতির বলি। আমরা শাসানির ভয়ে চুপ করে রয়েছি, আমাদের প্রত্যেকের ঘর আছে, বাবা-মা-ভাই-বোন রয়েছে। যাদের নিরাপত্তা আমার বিদ্রোহে যে কোন মূহুর্তে বিঘ্নিত হতে পারে। তাই সর্বস্বান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা সহ্য করে যাই। সহ্য করতে করতে আমাদের ভেতরের বারুদগুলো ক্রমশঃ মিইয়ে যায়। শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াবার সময় তখন পেরিয়ে গেছে। এতটাই অসহায় আমরা যে নিজের দাবিকে ছিনিয়ে আনতে শিখিনি; শিখেছি ধনীর উঞ্ছবৃত্তি ও ক্ষমতাসীনের অনুগ্রহকে ন্যায্য পাওনা হিসেবে মেনে নিতে। অধিকারের লড়াই আমাদের কাছে দূরঅস্ত, আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ-রফাতে বিশ্বাসী। ছবিতে চোখ, কান, মুখ বন্ধ করা বাঁদরের মতো থাকতে আমরা অভ্যস্ত; আমরা বুদ্ধিমান-জীব একেই

ভবিতব্য বলে মেনে নি। বধূহত্যা, ধর্ষণ, বোমাবাজি, তোলাবাজি- সিন্ডিকেট নামক শোষণের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে আমাদের কিছু যায় আসে না, আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ। এই আপোষ পন্থায় মানুষ মজে। অন্তর্মুখী মানুষগুলো নিজস্ব চাওয়া-পাওয়াতেই আটকে থাকে। কেন পেলাম না? এই নিয়ে অন্তরে অন্তরে গুমরে ওঠে; বাইরে এর বিস্ফোরণ ঘটে না। অন্তরে অন্তরে সবাই আমরা ভেজা বারুদ হয়ে রয়েছি। স্বপ্নময়ের লেখায় তাই ফুটে ওঠে সাম্প্রতিককালীন রাজনীতির জাঁতাকলে পিষ্ট এক অসহায় বিপন্ন মানবতার চিত্র।

উপন্যাসে রাজনীতির প্যাঁচে পড়ে উপেক্ষিত ও উপহাসিত হয়েছে হরিপদ। 'জলে কুমীর ও ডাঙায় বাঘে পাওয়া' তার অবস্থা। রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে হরিপদকে তুরুপের তাস রূপে ব্যবহার করেছে সমাজের দুই প্রভাবশালী প্রোমোটার- বাঁকা সাহা ও গুরুচরণ। এলাকা দখলের লড়াইয়ে জোর যার মুলুক তার-এ প্রবাদ চিরন্তন। তাই খুন হতে হয় প্রমোটার বাঁকা সাহাকে; প্রতিদ্বন্দ্বী গুরুচরণের উপর লোকে দোষারোপ করলেও আইনের চোখে সে নির্দোষ। ২০০৯ সালে লোকসভা ভোটের পর এলাকায় দখল নেয় তৃণমূল। পরিবর্তনের এই জোয়ারে দল পরিবর্তন যে বড় মাত্রায় ঘটেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ক্ষমতার হস্তান্তরের রাজনীতিতে দলের বদল হয় কিন্তু ক্ষমতাসীন মানুষেরা একই রয়ে যায়। তাই দল বদলের এই রাজনীতিতে একই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের অভাব লক্ষ্য করা যায়। আসলে পার্টিতে আসে লোকে সুবিধা নেওয়ার জন্য, তাই সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলে সংঘর্ষ বাধে। বাঁকা সাহা ও গুরুচরণের সমস্যাটা মূলত প্রোমোটারির স্বার্থ ও ভবিষ্যত্ নিয়ে। তাই এদের মতো লোকের কাছে কোন দল ক্ষমতাসীন তা বড় ব্যাপার নয়; যে দল তাদের স্বার্থ পূরণে সহায়ক হবে সেই দলকেই এরা সমর্থন করবে।

সূচক শব্দ : রাজনৈতিক উপন্যাস,বিপন্ন মানবতার বিষাদগাথা, ক্ষমতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, প্রোমোটারি ব্যবসা ওসিন্ডিকেট, সামাজিক ব্যাধি- ধর্ষণ।

মূল আলোচনা : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখায় বৈচিত্র্য রয়েছে, তথ্যের সমাহারে মেধা, বৌদ্ধিকতা ও অভিজ্ঞতার মিশেলে উদ্বাবনী শক্তিতে লেখক বিপন্ন সময়ের দলিল নির্মাণ করেছেন। যাতে মিশে রয়েছে ক্ষমতা বদলের রাজনীতি। লেখক উপন্যাস সূচনা করার পূর্বে এক স্থানে লিখেছেন- "যে সময়ের মধ্যে আমরা স্থিত রয়েছি, সেই সময়কে কেন্দ্র করে কিছু লেখার মধ্যে একটা ঝুঁকি থেকে যায়। একটু দূরে সরে গিয়েই সময়কে বিচার করা রীতি সিদ্ধ। তবু সময়কে এড়িয়ে গিয়ে চোখ বুজে কোকিলের দিকে কান ফেরানোয় অন্তরের সায় থাকে না অনেক সময়। এই উপন্যাসের সমসময়ের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা, মূল চরিত্রের সাধারণ জন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস"। আসলে প্রতিদিন আমরা নিজেদেরকে অপরের কাছে বিকিয়ে দিচ্ছি। প্রতিনিয়ত এই শাসক শ্রেণির মানুষেরা আমাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। স্বপ্নময় লিখেছেন "পৃথিবীর নিয়মটা হল –বড়

মানুষেরাই ছোট মানুষদের আহা-উহু করবে, সহানুভূতি –স্বান্তনা এসব দেবে। ছোট মানুষেরা বড় মানুষদের এসব করে না”[১] তাই ‘মানীলোক’ স্বপ্নময়ের ভাষায় যার অর্থ ‘পয়সাওলা লোক’-এর কাছে আমরা সদা সন্ত্রস্ত ও মাথা নোয়ানো অবস্থাতে থাকাটাই ভবিতব্য বলে মেনে নি। স্বপ্নময়ের উপন্যাসে ঠেসে দেওয়া হয় জনপ্রিয়তার সস্তা মাল-মশলা, আবার অন্যদিকে এসব ছাপিয়ে উচ্চকিত হয়ে ওঠে মানবিক সুর। এই মানবিক সুরকে প্রকাশ করার জন্য তিনি বেছে নেন অতি সাধারণ মানুষকে। সময়ের সরলরৈখিকতাকে গ্রাহ্য করে তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠেছে বিপন্ন মানবতার বিষাদগাথা। ক্ষমতা, রাজনীতি, যৌনতাকে একটি মৌলিক দৃষ্টিকোন থেকে প্রকাশ করেছেন লেখক। সমসাময়িক ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাচারিতা, বুজরুকি তথা গোঁজামিলকে তুলে ধরেছেন লেখক। রাজনৈতিক গুন্ডাদের শাসানিতে খাঁচায় বন্দি সাধারণ মানুষ। শাসক বদলায় ক্ষমতার রূপ বদলায়, পরিবর্তন আসে কিন্তু শোষক-শোষিত শ্রেণির অবস্থান একই থাকে। দুনিয়াতে সৎ ও সাধারণ মানুষেরা সর্বদাই দুঃখী। এরাই হয় soft target, রাজনীতির বলি। আমরা শাসানির ভয়ে চুপ করে রয়েছি, আমাদের প্রত্যেকের ঘর আছে, বাবা-মা-ভাই-বোন রয়েছে। যাদের নিরাপত্তা আমার বিদ্রোহে যে কোন মূহুর্তে বিঘ্নিত হতে পারে। তাই সর্বস্বান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা সহ্য করে যাই। সহ্য করতে করতে আমাদের ভেতরের বারুদগুলো ক্রমশঃ মিইয়ে যায়। শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াবার সময় তখন পেরিয়ে গেছে। এতটাই অসহায় আমরা যে নিজের দাবিকে ছিনিয়ে আনতে শিখিনি; শিখেছি ধনীর উঞ্ছবৃত্তি ও ক্ষমতাসীনের অনুগ্রহকে ন্যায্য পাওনা হিসেবে মেনে নিতে। অধিকারের লড়াই আমাদের কাছে দূরঅস্ত, আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ-রফাতে বিশ্বাসী। ছবিতে চোখ, কান, মুখ বন্ধ করা বাঁদরের মতো থাকতে আমরা অভ্যস্ত; আমরা বুদ্ধিমান-জীব একেই ভবিতব্য বলে মেনে নি। বধূহত্যা, ধর্ষণ, বোমাবাজি, তোলাবাজি- সিন্ডিকেট নামক শোষণের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে আমাদের কিছু যায় আসে না, আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ। এই আপোষ পন্থায় মানুষ মজে। অন্তর্মুখী মানুষগুলো নিজস্ব চাওয়া-পাওয়াতেই আটকে থাকে। কেন পেলাম না? এই নিয়ে অন্তরে অন্তরে গুমরে ওঠে; বাইরে এর বিস্ফোরণ ঘটে না। অন্তরে অন্তরে সবাই আমরা ভেজা বারুদ হয়ে রয়েছি। স্বপ্নময়ের লেখায় তাই ফুটে ওঠে সাম্প্রতিককালীন রাজনীতির জাঁতাকলে পিষ্ট এক অসহায় বিপন্ন মানবতার চিত্র। যার বাহক হরিপদর মতো এক ছা-পোষা ব্যক্তি।

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর জন্ম হয় ১৯৫১ সালের ২৪ আগস্ট উত্তর কলকাতায়। তিনি রসায়নে বিএসসি, বাংলায় এমএ, সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা করেছেন। এছাড়াও সংস্কৃত জানতেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় মাত্র ২২ বছর বয়সেই দেশলাইর সেলসম্যান হিসেবে। তারপর নানা পেশা বদলের পর যুক্ত হন আকাশবাণীর সঙ্গে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তিনি লেখালেখির শুরু

করেন। তাঁর প্রথম গল্প 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও ছোট কাগজেই বেশি লিখেছেন। এ যাবত্ প্রায় সাড়ে তিনশোর মতো ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী' প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ এবং মনোজ্ঞ রচনা কিংবা রম্যরচনাতেও তাঁর কলম সমানভাবে সাবলীল। তাঁর রচিত 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসটি ২০১৫ সালে আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ২০০৫ সালে 'অবন্তীনগর' উপন্যাসের জন্য তিনি বঙ্কিম পুরস্কার পান। এছাড়াও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কার, সর্বভারতীয় কথা পুরস্কার, তারাশঙ্কর স্মৃতি পুরস্কার, গল্পমেলা, ভারতব্যাস পুরস্কার লাভ করেছেন। লেখালেখি ছাড়াও তিনি গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

নিজের সাহিত্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে স্বপ্নময়ের বক্তব্য তুলে ধরলাম- "১৯৭৮ সালে 'প্রমা' নামে একটি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদকমণ্ডলীতে কয়েকটি নক্ষত্র— অরুণ মিত্র, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার। কার্যকরী সম্পাদক সুরজিৎ ঘোষ। ...প্রথম সংখ্যাটি থেকেই পত্রিকাটি ছিল বেশ উঁচু মানের। মহাশ্বেতা দেবী, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সৌরীন ভট্টাচার্য, শিশিরকুমার দাশরা এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। এক দিন সুরজিৎ ঘোষের চিঠি পেলাম। বলছেন—এই পত্রিকায় গল্প লিখতে হবে। আমি আহ্লাদিত। ওই পত্রিকায় গল্পও ছাপা হতে দেখেছি। মহাশ্বেতা দেবী, মতি নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও জয়ন্ত জোয়ারদার, সাধন চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ মজুমদারদের গল্প দেখেছি। ওঁদের সঙ্গে আমিও? এর আগে পাঁচ-সাতটার বেশি গল্প লিখিনি। প্রথম বইটির কথা বলতে গিয়ে প্রথম লেখাটার কথাও একটু বলতে হয়। ১৯৭২ সালে আমার প্রথম গল্প ছাপা হয় 'অমৃত' পত্রিকায়। মণীন্দ্র রায় ছিলেন সম্পাদক। পরের গল্প দুটো 'চতুরঙ্গ' এবং 'মধ্যাহ্ন' পত্রিকায় পাঠাই। ছাপা হয়। এর পর কয়েক বছর লেখা হয় না। চাকরির চেষ্টা, চাকরি পাওয়া, ছাড়া, আবার চেষ্টা ...১৯৭৩-১৯৭৭ তেমন লিখিনি। গল্পের উপাদান চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছি শুধু। বাগবাজারের এক গলির ছেলের কাছে কত বড় পৃথিবীর কতগুলো জানলা খুলে গেল কয়েকটা বছরে। যাদব-কুর্মি-ভূমিহার; ছাতু-লিট্টি; লোন্ডা-ঝুমুর নিয়ে বিহার। পশ্চিমবাংলার গ্রামের গভীরে গিয়ে দেখলাম মাটির সঙ্গে মানুষের কী নিবিড় আর জটিল সম্পর্ক। অবাক হয়ে দেখি, ধানের ভিতরেও দুধ হয়। ধান-খাওয়া মাঠের ইঁদুর এবং ইঁদুর-খাওয়া মানুষের আহ্লাদ। হাঁড়ি-ভর্তি গাঁজলা-ওঠা তাড়ি ঘিরে গাঁজলা-মুখ মানুষের সান্ধ্য সঙ্গীত। অন্ধকারে আকন্দ-ধুঁধুল জোনাকিতে ভরে গিয়েছে। বাবুইয়ের বাসা দোলে দখিনা বাতাসে! আলো আর বুলবুলি খেলা করে। পটে আঁকা ছবিটির মতো ছোট্ট নদীটির চরে শিশুরা করে খেলা, নিজেদের ত্যাগ করা বিষ্ঠা থেকে কাঠির আগায় বের করে নেয় নিজের পেটের কৃমি, খেলা করে। শুখা নদীর বালি খুঁড়ে জল বের করাও দেখি। শুনি গো-রাখালের কথকতা। বুঝলাম রায়ত-আধিয়া-কোর্ফা-মুনিষ-মাহিন্দার। এ যেন এক বিস্ময়-বিহ্বল আবিষ্কার। আমার চোখে ক্রম-উন্মোচিত গ্রামবাংলাকে নিয়ে পর

পর কয়েকটা গল্প লিখতে থাকি। খুব ছোট কাগজেই লিখতাম। পদাবলী, কল্পবাণী, উত্তরকাল... বড় কাগজে লেখা না-পাঠানোর পক্ষে কোনও জুতসই যুক্তি আমার কাছে নেই। পবিত্র সরকার তখন শিকাগো থেকে ফিরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার পড়াচ্ছেন। উনিই সুরজিৎ ঘোষকে আমার কথা বলেন। আমি প্রমা-য় গল্প লিখি। প্রথম গল্পটি সম্ভবত **'ভাল করে পড়গা ইস্কুলে'**। তখন আমি হাওয়া অফিসে। এর কিছু আগে 'ভূমি-ভূস্বামীর ভূত ও ভবিষ্যত' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম একটা ছোট কাগজে। ভূমি-রাজস্ব দফতরে চাকরির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় প্রবন্ধটি লেখা। নামকরণে বিনয় ঘোষের প্রভাব। প্রবন্ধটা পড়ে অনুষ্টুপ সম্পাদক অনিল আচার্য আমাকে ওঁর পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে বলেন। উনি তখনও আমার গল্প পড়েননি। আমি বলি, গল্পই তো লিখি, গল্প লিখতেই ভাল লাগে। উনি বলেছিলেন, তা হলে তা-ই দিন। ভাল লাগলে ছাপব। এর পর ছাপা হতে লাগল প্রমা এবং অনুষ্টুপে। আমার বেশ খাতির হতে লাগল— কারণ দুটো গণ্য করার মতো পত্রিকায় বছরে দুটো করে গল্প বেরচ্ছে। নান্দীকার-এর ঘরে একটা গল্প পড়া হয়েছে, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটক করার কথা ভাবছেন।

কফি হাউসে আসতেন সুরজিৎ ঘোষ। উনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। মুজতবা, বাদল সরকার, শঙ্খ-শক্তি-থার্মোডাইনামিক্স মুখস্থ বলে যেতেন। ওই আড্ডায় ১৯৮০ নাগাদ বললেন, বইও পাবলিশ করব প্রমা থেকে। বাছা বাছা বই বেরুবে। তার পর কফি হাউসে এক দিন বললেন, স্বপ্নময়, দশ-বারোটা গল্প রেডি করো। তোমার একটা বই করব। ...তত দিনে সতেরো-আঠেরোটা গল্প বেরিয়েছে। আমি দশটাই বাছলাম (বাকিগুলোর সন্ধান আমার কাছেও এখন আর নেই)। বেছে নেওয়া সব ক'টা গল্পই ছিল মাটির সঙ্গে জড়ানো মানুষদের নিয়ে। কৃষি মজুর, বর্গাচাষি, ভূমি সংস্কার করতে আসা সরকারি কর্মচারি, জোতদার, এরাই ছিল সব মুখ্য চরিত্রে। বইটার নাম দেব ভেবেছিলাম, 'মা-মাটি-মানুষ'। একটি গল্পে, ভূমিহীনদের বিলি করা জমি কী ভাবে আবার পুরনো মালিকের কাছেই ফিরে যায়, সেই কাহিনি বলা ছিল। গল্পটার নাম ছিল 'ভূমির নিত্যতা সূত্র'। পদার্থবিদ্যার 'শক্তির নিত্যতা সূত্র' মাথায় রেখে ওই নামকরণ, যে সূত্রের প্রতিপাদ্য হল, শক্তির বিনাশ নেই। সে কেবল রূপ পালটায়। শেষ পর্যন্ত বইটির নাম 'ভূমি সূত্র' রাখলাম। ভাগ্যিস নাম পালটেছিলাম। খরাক্লিষ্ট জমির ছবির ওপর, ভূমি সম্পর্কিত আইন ও ভূমি বিরোধের খবরের কাটিং কোলাজ করে একটি প্রচ্ছদ তৈরি করেছিলেন দেবব্রত রায়। প্রুফ দেখেছিলেন পবিত্র সরকার। বইটিতে কোনও ছাপার ভুল ছিল না। ১৯৮২ সালের বইমেলার মধ্যেই বইটি বেরিয়েছিল। মনে আছে, আবেগের বিহ্বলতা-জনিত কোনও থরোথরো অনুভূতি হয়নি। ব্যাগে করে দশটি বই নিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে। মা বেঁচে নেই। বাবা এক বার দেখলেন, ব্যস। ক'দিন পরে সুরজিৎ ঘোষ জানালেন, মহাশ্বেতা দেবী বইটা পড়েছেন। কথা বলতে চাইছেন। তাড়াতাড়ি যাও। ওঁকে প্রথম দেখার

অনুভূতি এখন থাক। চার বছরে প্রথম সংস্করণ শেষ হয়েছিল। পরে আরও দুটো সংস্করণ হয়। এখন বইটি পাওয়া যায় না। বই আর বউ একই সময় হয়েছিল আমার। বইটি যখন সদ্যপ্রকাশিত, আমিও সদ্যবিবাহিত। একটা কপি রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পাওয়া আমার হেডমাস্টার শ্বশুরমশাইকে দিয়েছিলাম। ক'দিন পর উনি বইটা ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, 'পড়া গেল না।' দেখলাম গল্প সংশোধন করেছেন। গু কেটে বিষ্ঠা, রাঁড় কেটে বিধবা। এক জায়গায় ছিল একটি বালক 'বাগালি' না করে স্কুলে যাচ্ছে বলে ওর বাবা ওকে বলছে, অ্যাঁড় ছিচে দুব। কেটেছেন। কিন্তু বিকল্প শব্দ বসাতে পারেননি"[২]।

সুবল সামন্ত সম্পাদিত 'বাংলা গল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে অরুণ কুমার ঘোষ স্বপ্নময়ের লেখা প্রসঙ্গে বলেছেন- "তাঁর গল্পের থিম হিসেবে প্রাধান্য পায় শোষণ বঞ্চনা, গ্রাম-নগরের সমাজ জীবনে ও রাজনীতিতে ব্যাপক দুর্নীতি, সমাজ-পরিবেশের অবক্ষয়ে ব্যক্তি চরিত্রের বিনষ্টি, মধ্যবিত্ত নিবীর্যতা ও সুবিধাবাদ, মুনাফার সর্বগ্রাসী লোভ, পার্থিব সাফল্য লাভের নির্বিবেক লোলুপতা, স্বপ্নময় গ্রামীণ পরিমন্ডলের বাস্তবতাকে সজীব সানুপুঙ্খতায় উপস্থাপন করেছেন, অবিরত ব্যবহার করেছেন গ্রামীণ ভাষার সংলাপ"[৩]। আলোচ্য 'ভেজা বারুদ' উপন্যাসেও স্বপ্নময়ের লেখায় নাগরিক সমাজ জীবনে দুর্নীতি, রাজনীতি, ব্যক্তি চরিত্রের বিনষ্টি, মধ্যবিত্তের নিবীর্যতার বিষয় ঘুরেফিরে এসেছে। তবে চরিত্রের অন্তরভেদী প্রক্রিয়াতে না গিয়ে চরিত্রকে ওপর ওপর থেকে দেখা স্বপ্নময়ের লেখার ত্রুটি বলে মনে হতে পারে। স্বপ্নময় নিজেও একথা স্বীকার করেছেন। তবে এটা অনেকটা উদ্দেশ্য প্রনোদিত; সাহিত্যিক রবিশঙ্কর বলের অকাল মৃত্যুর শ্রদ্ধাজ্ঞাপণ অনুষ্ঠানে স্বপ্নময় তাই বলেছেন- "আমার লেখার ধরণের সঙ্গে রবির লেখার অনেকটা তফাত্। আমি ব্যক্তি মানুষের ভেতরে খুব একটা ঢুকতাম না, রবি ব্যক্তি মানুষকে প্রাধান্য দিত। ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্বাসের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল। আমি একটা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং এক্সিসটেনশিয়ালিজমের পরিবর্তে সামাজিক মনে এবং তার প্রভাবে বিশ্বাসী ছিলাম। ফলে আমার গল্পের বিষয় আঙ্গিকে আলাদা হলেও আমার সঙ্গে খুবই সুসম্পর্ক ছিল। কারণ মতবাদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল রবি, ফলে আমার বিশ্বাসকে ও মর্যাদা দিত"[৪]।

রাজনীতির প্যাঁচে পড়ে উপেক্ষিত ও উপহাসিত হয়েছে হরিপদ। 'জলে কুমীর ও ডাঙায় বাঘে পাওয়া' তার অবস্থা। লেখক হরিপদর এই অসহায় দশার যথার্থ চিত্র পরিবেশন করেছেন- "হরিপদ বুঝতে পারে –ওর হল মারীচের দশা। রামে মারলেও মরবে, রাবনে মারলেও মরবে। যে কোনও একজনের হাতে মরতেই হত মারীচকে। মারীচ রামের হাতে মরাটাই বেছে নিয়েছিল। ও গুরুপদর নুন খেয়েছে"[৫]। রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে হরিপদকে তুরুপের তাস রূপে ব্যবহার করেছে সমাজের দুই প্রভাবশালী প্রমোটার- বাঁকা সাহা ও গুরুচরণ। এলাকা দখলের লড়াইয়ে জোর যার মুলুক তার-এ প্রবাদ চিরন্তণ। তাই খুন হতে হয় প্রমোটার বাঁকা সাহাকে; প্রতিদ্বন্দ্বী গুরুচরণের উপর লোকে দোষারোপ করলেও আইনের চোখে সে নির্দোষ। আলোচ্য উপন্যাসে উঠে

এসেছে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের আগে সিপিএমের গড় ছিল বরানগর ও মধ্যমগ্রাম এলাকা। অতঃপর ২০০৯ সালে লোকসভা ভোটের পর এলাকায় দখল নেয় তৃণমূল। পরিবর্তনের এই জোয়ারে দল পরিবর্তন যে বড় মাত্রায় ঘটেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ক্ষমতার হস্তান্তরের রাজনীতিতে দলের বদল হয় কিন্তু ক্ষমতাসীন মানুষেরা একই রয়ে যায়। তাই দল বদলের এই রাজনীতিতে একই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের অভাব লক্ষ্য করা যায়। আসলে পার্টিতে আসে লোকে সুবিধা নেওয়ার জন্য, তাই সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলে সংঘর্ষ বাধে। বাঁকা সাহা ও গুরুচরণের সমস্যাটা মূলত প্রোমোটারির স্বার্থ ও ভবিষ্যত্ নিয়ে। তাই এদের মতো লোকের কাছে কোন দল ক্ষমতাসীন তা বড় ব্যাপার নয়; যে দল তাদের স্বার্থ পূরণে সহায়ক হবে সেই দলকেই এরা সমর্থণ করবে। লেখক এই রাজনৈতিক দলগুলির এলাকা দখল ও তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের ভীতিকর ও নিস্পৃহ অবস্থার ব্যাঙ্গাত্মক চিত্রটি কুশলতার সাথে ব্যক্ত করেছেন- "...মেঠো পথে পিচ সেখানে বাণিজ্যবায়ু ঢোকে। বিউটি পার্লার, বার্গার, মধুচক্র। এই পুরো পথ জুড়ে এক একটা নফরগঞ্জ, জিরাট বদনাপুরে উন্নয়ন চলছে এবং কাক ডাকছে। মূল শহর থেকে তাড়িত মানুষ আরও ধনী হবে বলে ফ্ল্যাট কিনে রাখছে, তাই নির্মাণ শিল্প। তাই এলাকা দখল। এলাকা ভাগ একটা অলিখিত চুক্তি। চুক্তিভঙ্গ প্রায়শই হয়। জীবজগতে এলাকা ভাগ আছে। কুকুরদের নিজেদের মধ্যে এলাকা ভাগে নিয়ম আছে, আর বেনিয়ম তো নিয়মের মধ্যেই নিহিত থাকে। পুরুষ বাঘেরা নিজেদের শরীর থেকে ফেরোমন বার করে, ফেরোমন নিঃসরণ করে জঙ্গলের বৃক্ষলতায় লেপে রাখে, ফেরোমনের গন্ধে জানায় এলাকা আমার। মানুষ বাঘেদের ফেরোমন নেই, বোমা আছে। বোমার চিৎকৃত শব্দে জানিয়ে দেয় এলাকা আমার। সমাজবন্ধুরা বোমা বানায়, বোমা কেনে, ঐশ্বর্যের মতো রেখে দেয় অন্দরে, অন্তরে। মাঝে মাঝে বোমা ফাটে, জিন্দাবাদ ধ্বনি হয়, ছায়াপিন্ড মানুষেরা চাউ খায়, ম্যাগি খায়, নিজেদের মধ্যে অধোস্বরে বলে কী যে হচ্ছে এবং যা হচ্ছে সেটাকেই ভবিতব্য মেনে নেয়"[৬]।

মানুষ ওপরে ওপরে যতই পরিশীলিত হওয়ার চেষ্টা করুক কিন্তু তার মধ্যে আদিম সত্তার পাশব প্রবৃত্তিটি বিলুপ্ত হয় না। তার সুপ্ত জৈব প্রবৃত্তিটি ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ পেলেই ভদ্র আবরণ উন্মোচন করে অত্যন্ত নির্লজ্জ রূপে প্রকাশ পায়। বর্তমান সময়ে মানুষের আচরণ বর্বরতা তথা প্রাগৈতিহাসিক স্তরে নেমে গেছে। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ও নারীর শরীরের দখলদারীতে মানুষের লোভ ও যৌন রিরংসা নগ্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে গুরুচরণের মুম্বাচুম্বা ড্যান্স-বারটি তার প্রমাণ দেয়। পূর্বে অবচেতন স্তরে যৌন চেতনা সক্রিয় ছিল বর্তমানে চেতনার গভীরে যৌনতার অপ্রতিহত সক্রিয়তা। মানুষের রুচি অতি নিম্নগামী। সমাজের বিভিন্নস্তরে এই নির্লজ্জ বেহায়াপনা, নারী শরীর সংক্রান্ত খোলাখুলি মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। তাই স্বপ্নময়ের লেখায় এই

অবস্থার প্রতি কটাক্ষ বিদ্রূপ বর্ষিত হয়। আলোচ্য উপন্যাসে চানুও এই প্রবৃত্তির শিকার; গুরুচরণের পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট থাকাকালীন চানু গুরুচরণের ল্যাপটপে ইন্টারনেটে পর্ণ সাইট খুলে দেখে। লেখক এ প্রসঙ্গে বলেছেন- "ও বেশ বুঝতে পারছে ওর মনের ভিতরে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকা তেলের বিজ্ঞাপণের সাপটা মাথা ওঠাচ্ছে"[৭]। তাছাড়া গুরুচরণের মতো তার ছেলের মধ্যেও বয়ঃসন্ধি কালের প্রবৃত্তির তাড়না প্রবল রয়েছে। বেকারত্বের সমস্যায় কিভাবে অপচিত হয়ে যায় মানুষের মুল্যবোধ ও নীতিবোধ চানু তার বড় উদাহরণ। গুরুচরণের লোভের থাবা চানুকে গ্রাস করে। চানুর সেখান থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। চানুকে চাকরি দিয়েই গুরুচরণ হরিপদর পরিবারকে কব্জা করে। উপন্যাসের শেষাংশে গুরুচরণ চানুকে তার ধর্ষিতা দিদি সুলতাকে বিয়ে করতে চাওয়ার কথার মধ্যে ক্ষমতাবাণ লোকের হুমকি রয়েছে। "তোমার বোনটা সুন্দরী। তাছাড়া ঘটনাটা তো জানি। ভেরি স্যাড। তোমার বাবার সঙ্গে কথা বল। তোমার বোন তো নয়। দিদি। বয়স তো হয়েছে। ফেলে রেখেছ। রাস্তায় মাংস পড়ে থাকলে শিয়াল কুকুর টানাহিচড়া করে। আমি যদি ওকে... ও কিন্তু উদ্ধার হয়। তোমার ফ্যামিলিটাও বাঁচে। আর শুনো, তোমার বাবা খুব ব্লান্ডার করেছে। সাদা কাগজে সই করে রেখেছে। যা হোক, ওটা এখন আমার কাছেই আছে"[৮]। ঘটনাতে দেখতে পাই হরিপদর মেয়েকে রেপ করিয়ে তাকে ভাতে না মেরে, জাতে মারার চেষ্টা ফলপ্রসু হয়েছে। এরপরে সাদা কাগজে হরিপদর সই গুরুচরণের কাছেই রয়েছে, এই হুমকিতে হরিপদকে একেবারে ঘটি হারা করা অর্থাত্ ধনে-প্রাণে সর্বস্বান্ত করার আভাষ মেলে। কথায় বলে ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। গুরুচরণও নিজের অর্থের জোরে পলিটিক্যাল ইমেজ গড়ে তুলে। মধ্যমগ্রামের সর্বত্র প্রোমোটারি ব্যবসার মাধ্যমে সে নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করতে গুন্ডা পুষতো। এলাকার অনেক যুবকদের কাজ ও অর্থ জুটিয়ে সবাইকে বশ করে এভাবেই সে নিজের দলের লোক বৃদ্ধি করেছিল; এভাবেই জড়ো করে কিট্টুদের। তাছাড়া নেতাদের কাছে নিজের পলিটিক্যাল ভাবমূর্তি ও ক্ষমতা জাহিরের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হল পোষা গুন্ডাদের দ্বারা এলাকা দখল। ভোটের আগে এভাবেই ভয় দেখিয়ে ক্ষমতায় আসতে হয়। এ রাজনীতি বহু পুরোনো। তাই ভোটের লোভে ক্ষমতাসীন প্রশাসনও ওদের ব্যভিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইনি বন্দোবস্ত নেয় না। ফলে দাগী আসামী ঘাগী হয়ে সমাজে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষমতা জাহির করে বোমা ও ধর্ষণে। ফলে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা মানুষগুলো এই তামাশাকে চোখে দেখেও 'ভেজা বারুদ' হয়ে থাকে।

হরিপদর জীবনের প্রথম পর্বে রয়েছে বরানগরের রায়বাড়ির ভাড়াটে গৃহে বেড়ে ওঠা। তারপর ক্রমশঃ হরিপদের চোখে কোলকাতার একটু একটু করে বদলে যাওয়ার চিত্রের ছবি এঁকেছেন লেখক। নতুন কোলকাতার বিচিত্র জনজীবনের সাথে তার পরিচয় বেড়েছে। পূর্বেকার ফাঁকা ফাঁকা মাঠগুলো ও জলা জঙ্গলগুলো ক্রমশঃ লোকবসতিতে ভরে উঠেছে। আলোচ্য উপন্যাসে উঠে এসেছে পুরোনো কোলকাতার

ইতিহাসের চিত্র, বিশেষ করে বরানগর ও মধ্যমগ্রামের পুরোনো ইতিহাসের চিত্র। লেখকের গবেষণা সমৃদ্ধ তথ্যের কিছু অংশ তুলে ধরলাম- "পলাশির যুদ্ধের পরে ইংরেজরা ওলন্দাজদের আর সহ্য করতে পারত না। এক বাঙালি মুনশিকে পাঠিয়েছিল ক্লাইভ ওলন্দাজদের কাছে বলেছিল- কুঠি ছেড়ে চলে যেতে। একটা বার্তা লেখা ছিল একটা চিঁড়েতনের গোলামের টেক্কার গায়ে- 'গেট আউট'। ওরা বলেছিল কেন গেট আউট? যাব না। মুনশি ক্লাইভকে গিয়ে বলেছিল- যাবে না বলছে, ক্লাইভ তখন কর্নেল ফোর্ডকে একটা অর্ডারে লিখলেন, ফোর্ড তিনশো সৈন্য নিয়ে বরানগর আক্রমণ করে ওলন্দাজদের তাড়িয়ে দিল। এটাই তাসের যুদ্ধ। একটা জায়গার নাম ছিল তাসের মাঠ। সেই যুদ্ধের স্মৃতি। মাঠ নেই। হরিপদ ছোটবেলাতে ওখানে মাঠ দেখেছিল, রাম যাত্রা হত। বহুদিন হল মাঠটাও নেই। বাড়ি বাজার, পাইস হোটেল। ওখানে আবার গোলাবারুদের শব্দ হয়েছিল, সেই সত্তরের দশকে। সেই বরাহনগরের বড়বাড়ি। বাইরের দিক থেকে ওঠা খাড়াই সিঁড়ি। একতলায়, যেখানে এককালে গুদাম ছিল, ওখানে পর্টিশন করে অনেক ছোট ছোট ঘর করা হয়েছিল"[৯]। অন্যত্র আবার মধ্যমগ্রামের শহরতলিতে বদলে যাওয়ার চিত্র ধরা পড়েছে- "এলাকাটা তো নতুন করে গড়ে উঠেছে। পনের-কুড়ি বছর আগেও তো গ্রামই ছিল। চাষ হোত, তৈশিরা ঘাস হত। নফরগঞ্জ, জিরাট, বদনাপুর এসব এলাকায় ছোট ছোট জনবসতি। একটা ডেয়ারি হল বিশ বছর আগে। রাস্তা চওড়া হল, বাস চলাচল শুরু হল, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কো-অপারেটিভ করে বাড়ি বানাল, মধ্যমগ্রাম আর সোদপুরের রেললাইনের উপর ফ্লাই ওভার হল, এদিকে চলে এল ব্যাঁকা সাহা, ভীম ঘোষেরা। অটো চলাচল শুরু হয়ে গেল, দুটো ঝিল বুজে গেল, প্লট করে বিক্রি হতে লাগল। এবার ঘরবাড়ি উঠছে, সমাজবন্ধুরা তৈরি হয়েছে, যারা বাড়ি করছে, ইঁট বালি কোনও না কোনও সমাজবন্ধুর কাছ থেকেই নিতে হবে।"[১০]।

বদলে যাওয়া কোলকাতা শহরে নতুন সংযোজন সিন্ডিকেট। লেখক গুরুচরণের মুখে সিন্ডিকেট কি? তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন- "মানে –যে যা খুশি করতে পারে না। এলাকায় একটা ডিসিপ্লিন রাখার জন্য একটা সিন্ডিকেট করছি। নতুন নতুন লোক আসতাছে, সবারই ঝি দরকার, কামের লোক দরকার্, অনেক বাড়িতে বুড়ি-বুড়া আছে, মিঞা বিবি নোট কামাইতে বাইর হইয়া যায়, ঘরে আয়া দরকার হয়, সেই কারণে একটা সিন্ডিকেট করলাম। আমার ছোট ভাই চালায়। খালি বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাইয়ের জন্যই সিন্ডিকেট লাগে এমন কথা নাই। সিন্ডিকেট ছাড়া কন্ট্রোল থাকে না। রিকশা ইউনিয়নের উপর আমাগোর কন্ট্রোল আছে। সেই জন্য সবাই একোই ভাড়া নেয়। এখান থেকা আপ টু ছোট মসজিদ আট টাকা, তারপর জয়পুরের মোড় পর্যন্ত দশ টাকা, সবার একরকম ভাড়া। নইলে খারাখারি বাইধ্যা যাইত। কাজের লোক-নার্স-আয়াবাড়ির কন্ট্রাকটার সাপ্লাইয়ের সিন্ডিকেটের নাম সমাজবন্ধু। নাড়ুর চায়ের দোকানের

পাশেই খাপরার ঘর। ওখানে গেলে পুরোইতও সাপ্লাই করে। গলায় একটা পৈতে ঝুলাইয়া আমি বড় পুরোইত, কাঁসার বাসন চাই, বিশখান শাড়ি চাই কইলেই চলব না। সমাজবন্ধুতে নাম লিখাতে হয়, তারপর ওরাই সাপ্লাই করে। একদম ঠিকঠাক মাল"[১১]। হরিপদ এসব শুনে একটু অবাক হয়, বাম আমলে বরানগরে রামপিয়ারি, বোঁচা নাড়ু, ভুটে শোনা নামে রাজনৈতিক তোলাবাজরা ছিল কিন্তু সিন্ডিকেটের নামে তোলাবাজি এই প্রথম। তাই তো হরিপদ তার বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যে পুরোহিতকে সমাজবন্ধুর কাছ থেকে এনেছে তার অভিজ্ঞতায় গুরুচরণের ভাই নানুবাবু "সাক্ষাত ষাঁড়। ষাঁড় ছাড়া কী বলব? ফোকটে খায়। শালা তোলাবাজ। ...আচ্ছা বলুন তো, লোকের বাড়ি কাজ করে ওকে কেন টাকা দিতে যাব, এতে আমার আপনার সবারই তো ক্ষতি। বলতে যাবেন না যেন,"[১২]-সব কিছুতেই রয়েছে মানুষের ভেতরে ভেতরে গুমরে ওঠার অবস্থা, গর্জে উঠলে ক্ষতি অনিবার্য। তাই চুপ করে থাকতে হয়।

সংবাদপত্র খুললে আমরা একটাও ধর্ষণের ঘটনা পাব না এমন কখনো হয় না। ধর্ষণের অপরাধীর শাস্তি না পাওয়ার কারণে এই অপরাধ প্রবণতার হার ক্রমশঃ বেড়েছে। অনেকে আবার আইনের সহায়তা না নিয়ে সালিশির মাধ্যমে বিষয়টির রফা করে থাকেন। আবার কেউ কেউ পরিবারের সম্মানের কথা ও ধর্ষিত মেয়েটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছুই বলেন না বিষয়টি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অনেক সময় ধর্ষনের অপরাধী ক্ষমতাসীন দলের খুব কাছের হলে, মোটা টাকায় আইনের চোখে ধুলো দিয়ে সমস্ত প্রমাণ লোপাট করে ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়। আলোচ্য উপন্যাসে ধর্ষণের শিকার দুই নারী। যে সময়ের রাজনৈতিক নেতা ঘরে ছেলে ঢোকানোর বার্তা দেয়, যখন ক্ষমতার প্রকাশ হয় সন্ত্রাসে-হুমকীতে ধর্ষণে; তখন নৈতিকতা শিকেয় তুলে এ হেন আচরণ অস্বাভাবিক নয়। সমাজপটে মেয়েদের অবস্থান বদলে গেলেও মহিলা-নিরাপত্তা কতটা এ সমাজে? এই প্রশ্নটির উত্তর এখনো অধরা। খবরের কেন্দ্রে আসা এই ঘটনাগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যেকোনো মূহুর্তে পথচলতি ও গৃহকোনে আবদ্ধ মেয়ের সর্বনাশ ঘটতে পারে। যা প্রশাসনের কড়া আইনের তোয়াক্কা না করেই ঘটে; অনৈতিক পথে আইন-রক্ষকের মদতে সাক্ষপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হয়। আলোচ্য উপন্যাসে আইন-রক্ষকের মদতে পাপিয়ার জেলে রহস্যজনক হত্যাকে তাই আত্মহত্যা বলে সাজানো হয়। পাপিয়ার বাবারও মত তাঁর মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না। লেখকের এপ্রসঙ্গে বিবৃতিটিতে প্রকৃত ঘটনাটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে –"...পাপিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানা লকআপে রাখা হয়েছিল। বাথরুমে সে গায়ে আগুন দেয়। ওর পরনে ছিল সিনথেটিক শাড়ি। থানা লকআপে দেশলাই কী করে পেল তা নিয়ে তর্কবিতর্ক চলেছিল। কেউ বলেছে বৃহত কোনও চক্রান্ত করে মেয়েটাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখলে অনেক কিছু ফাঁস হয়ে যেত। দীঘার ওই হোটেলের ৪০৩ নম্বর ঘরে এরা দুজন ছাড়াও আর

একজন ব্যক্তিকে একদিন আগে ঢুকতে দেখা গিয়েছে বলে জানাচ্ছে হোটেলের কর্মচারীরা। ওই ব্যক্তিটি সারা দুপুর ছিলেন। তবে কি প্রমোটার সাহা মেয়েটিকে নিয়ে গিয়েছিল কাউকে ভেট দিতে"[১৩]। আবার চানুর দিদি সুলতার ধর্ষণের সংবাদ সমাজে অপমানিত হওয়ার ভয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে চেপে যাওয়া হয়। শুধু ধর্ষণ নয়, বধূহত্যার মতো কেসেও আইন-রক্ষকদের সহায়তায় অপরাধীরা ছাড় পেয়ে যায়। গুরুচরণ স্ত্রীকে অ্যাসিড খাইয়ে হত্যা করেও এভাবেই ছাড় পেয়েছে। লেখক চানুর দৃষ্টিতে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন -"বিকেলে বউদি মারা গেল। ডেথ সার্টিফিকেটে অ্যাসিড-ট্যাসিডের কোনও ব্যাপার লেখা ছিল না। মৃত্যুর কারণ হিসেবে নিরাপদ কিছু লেখা হয়েছিল। ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট লিখে মাথা নিচু করে ঠোঁট দাঁতে চেপে চলে গেল"[১৪]।

আলোচ্য উপন্যাসে রাজ্যে এই সময় সিন্ডিকেট, তোলাবাজি ও ব্যাভিচারের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে লেখক সরব হয়েছেন। পরোক্ষে আবার তাঁর দৃষ্টিতে সমকালে কেন্দ্রিয় সরকারের ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্তও যে সমাজে তাৎক্ষণিক অব্যবস্থা সৃষ্টি করেছিল, তার বর্ণণা দিয়েছেন। এই নোট বাতিলের একটি সমস্যা হল খুচরোর যোগান কমে যাওয়ার সমস্যা। ফলে বাজারে খুচরো সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য উপন্যাসে হরিপদ পুজোর নৈবেদ্য হিসেবে গুজিয়া প্রসাদ কিনতে গেলে মিষ্টি দোকানীরা খুচরো সমস্যায় তিন টাকার গুজিয়া পাঁচ টাকায় বিক্রি করেছে। ফলে সাধারণ মানুষকে হয়রানিতে পড়তে হয়েছে। তাই ব্ল্যাকমানি ও জাল নোটের বাড়বাড়ন্ত রোখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নোট বাতিলের নীতিতে যে সাধারণ মানুষের চরম ভোগান্তি হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আলোচ্য উপন্যাসে সুলতা অতি সাধারণ অনুজ্জ্বল একটি চরিত্র। একবিংশ শতাব্দীতে এই রকম নির্বুদ্ধিতায় ভরা নারী খুব কমই চোখে পড়ে। সুলতার পিতা হরিপদ যথাসাধ্য চেষ্টা করে সুলতার অভাব পূর্ণ করার। তবুও সুলতা ভেতরে ভেতরে পিপাসার্ত। তার মতো কোলকাতায় থাকা ও ভালো কলেজে পড়াশোনা করা মেয়ের এই রকম বুদ্ধিহীনের মতো টেলিভিশন সিরিয়ালের সব কিছুকেই সত্য বলে ধারনা করার ভাবনায় অসঙ্গতি রয়েছে। লেখক সুলতাকে এতখানি নির্বুদ্ধিতার মূর্তি হিসেবে না গড়লেই পারতেন। মেয়েদের বয়ফ্রেন্ড সম্পর্কে বন্ধুমহলে সে একপ্রকার ধারনা পেয়েছে। কলেজে থাকাকালীন দু-একটা প্রেম-প্রস্তাবও পেয়েছে, কিন্তু তখন এসব বিষয়কে সে আমল দেয়নি। পরে আবার কেন আমল দিল না এই ভেবেও সে পস্তেছে। তার মতন পরনির্ভর, বুদ্ধিহীনা মেয়ের ধর্ষণ যে অনায়াসেই সম্ভব হতে পারে লেখক বোধ হয় এভাবেই ভেবে ছিলেন। তাই ধর্ষণের পর সুলতাও পরিবারের সিদ্ধান্তই মেনে নিয়েছে। কিন্তু চানু গুরুচরণকে বিয়ে করার চাপ দিলে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার ইঙ্গিত দেয়। এভাবেই লেখক পরনির্ভর একটি মেয়ের আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত

নেওয়ার মাধ্যমে এক ধরণের প্রতিবাদ বা ভেজা বারুদে অগ্নিসংযোগ করার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের শেষে জনৈক বয়স্ক ব্যক্তির মুখেও একই বার্তা রয়েছে –"বুঝলে কিচ্ছু করার নেই। সব ব্যাধি, ব্যাধি। এক ফোঁটা রক্ত থেকেই সারা শরীরের জার্ম বোঝা যায়, একটা ঘটনা থেকেই বোঝা যায় সারা দেশ। আমরা জ্যান্ত থেকেও মড়া। এই জ্যান্ত থাকার মানে নেই। এখন আমরা সব ভেজা বারুদ। লোকটা চানুর পিঠে হাত দেয়। সহানুভূতির নাকি বলছে ওঠো জাগো...। স্বামী বিবেকানন্দর ছবির তলায় যেমন লেখাটা থাকে"[১৫]। কিন্তু আগুন জ্বলবে কী এই ভেজা বারুদে? লেখক সমাজের সামনে এই রকম একটি প্রশ্ন রেখে যান। তাই ছোটগল্পের আমেজ নিয়ে শেষ হয় উপন্যাসটি। শেষাংশের নাটকীয় মূহুর্তটি তুলে ধরলাম- "রাজি করাতে হবে দিদিকে। না হলে আবার রেপ। হরিপদ একজন ছোটখাটো সাধাসিধে লোক। কথাটা শুনেই তেড়ে উঠল। ...তার আগে কেরোসিন ঢেলে পোড়া। ...আমি রাজি...আমিও পুড়ে যেতে রাজি আছি রে ভাই...। আর মা বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁপতে লাগল। এবারে সেই তার সানাইটা বেজে ওঠে। পথের পাঁচালি সিনেমায় সর্বজয়ার কান্নার পিছনে যেমন বেজেছিল। সেই শব্দের ভিতরেই যেন মাদল বাজন –ওখানে যাব না"[১৬]।

তথ্যসূত্র

১. স্বপ্নময় চক্রবর্তী। ভেজা বারুদ। পত্রভারতী। কলকাতা। জানুয়ারি ২০১৬। পৃ-১৫।
২. আনন্দবাজার পত্রিকা।রবিবাসরীয়।'হেডমাস্টার শ্বশুর বললেন, পড়া গেল না'। ০২ আগস্ট ২০১৫।
৩. সুবল সামন্ত সম্পাদক।এবং মুশায়েরা। 'গল্প ও গল্পকার সংখ্যা'।৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। কলকাতা।১৪০৬।
৪. আনন্দবাজার পত্রিকা। রবিবাসরীয়। 'হেডমাস্টার শ্বশুর বললেন, পড়া গেল না'। ০২ আগস্ট ২০১৫।
৫. স্বপ্নময় চক্রবর্তী। ভেজা বারুদ। পত্রভারতী। কলকাতা। জানুয়ারি ২০১৬। পৃ-১২৩।
৬. তদেব। পৃ-১৩০,১৩১।
৭. তদেব। পৃ-১১৪।
৮. তদেব। পৃ-১৫৯।
৯. তদেব। পৃ-২৩,২৪।
১০. তদেব। পৃ-১২৯,১৩০।
১১. তদেব। পৃ-৪২,৪৩।
১২. তদেব। পৃ-৫০।
১৩. তদেব। পৃ-১৫৪।
১৪. তদেব। প-১৩৯।
১৫. তদেব। পৃ-১৫৮,১৫৯।
১৬. তদেব। পৃ-১৬০